তিন মূর্তির রহস্য অভিযান

১

অনিন্দ্য ভুক্ত

লিইবার ফিয়েরা

চায়ের কাপে তুফান ৯
সৌরভ গাঙ্গুলীর ব্যাট ৫৩
হারানো পান্ডুলিপি ৯৯

চায়ের কাপে তুফান

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা তখন সবে শোওয়ার তোড়জোড় করছে। হঠাৎই এক বিকট ধাতব আওয়াজে তড়াক করে উঠে বসল ঋজু।

ভাইয়ের ডাকটা চাপা হলেও তাতে আতঙ্কের ছোঁয়াটা কান এড়াল না রিয়ার। ও তখনও সেই পেপারব্যাকটাতেই মুখ ডুবিয়ে বসেছিল, সেই হাওড়া থেকেই যেটা ওর সঙ্গী।

ভাইয়ের ডাকে হেসে ফেলল রিয়া। ট্রেনে কিংবা প্লেনে চড়তে বেজায় ভয় ওর। যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়! এই তো আসার ক'দিন আগেই বেঁকে বসেছিল। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার খবরটা যেদিন কাগজে বেরোল, সেদিন।

'দিদি', বলে ডাক আর সেই ডাকের প্রতিক্রিয়ায় দিদির মৃদু হাসি, এই দুইয়ের মাঝের সময়টুকুতেই ঋজু আপারবার্থ থেকে নেমে এসেছে। মুখচোখ ফ্যাকাশে। রিয়ার পাশে গিয়ে বসতেই রিয়া জড়িয়ে ধরল ভাইকে।

শব্দটা তখনও চলছে। গুম গুম গুম। ট্রেন ফারাক্কা ব্রিজ পেরোচ্ছে। তারই আওয়াজ। রিয়া ভাইকে বলতেই মুহূর্তে তার মুখচোখ বদলে গেল। 'কই দেখি?', বলে জানলার দিকে তাকানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শব্দটা থেমে গেল।

'আমাকে আগে বলবি তো!', বলে বাচ্চা ছেলের মত মুখ ফুলিয়ে ঋজু নিজের বার্থে ফিরে গেল। ওর কাণ্ডকারখানায় তখন সামনের তিনটে বার্থের লোকেও হাসতে শুরু করেছে। ওদের সঙ্গে অর্কও।

রিয়া নিজের সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের মাথার চুলে বিলি কেটে দিল। ক্লাস নাইন হয়ে গেলে কীহবে, ওর ছেলেমানুষিগুলো এখনও যায়নি। বাড়ির ছোটগুলোর এমনই হয়। সবার আদর খেতে খেতে শৈশব আর কাটতেই চায় না।

রিয়া, অর্ক আর ঋজু। আঠারো, ষোলো আর চোদ্দ। ফার্স ইয়ার, ইলেভেন আর ক্লাস নাইন। কিন্তু কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। দিনরাত্তির ইন্টারনেট ঘেঁটে ঘেঁটে একজনের মাথা যেমন তথ্যের ভাঁড়ার, অন্যজনের তেমনই তুখোড় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আর সবচেয়ে বড় যে জন, ম্যাথ-অলিম্পিয়াডের স্বর্ণপদক-বিজয়িনী, যে কোনও জটিল অঙ্কই যেন তার কাছে জলভাত। আর তিনজনেই যথেষ্ট সপ্রতিভ, ইংরেজিতে যাকে বলে স্মার্ট।

তবে এই সমস্ত গুণ থাকলেই এমন তিনজনের একটা দল এত দূরের রাস্তা পাড়ি দেবার ছাড়পত্র বাড়ি থেকে পেয়ে যাবে তা তো আর হয় না। তবু যাচ্ছে যখন, ধরে নিতেই হয়, শুধু ওরা নয় ওদের মা-বাবাও ওদের মতই সপ্রতিভ।

নইলে বাঙালি বাবা-মাকে একটা বদনাম তো সেই কোন কালেই কবি দিয়ে রেখেছেন, 'রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি।' তা বলতে নেই, ওদের তিনজনের দু'জোড়া বাবা-মাকে এই বদনাম কেউ দিতে পারবে না যে তারা আতুপতু করে ছেলেমেয়ে মানুষ করায় বিশ্বাসী।

তিন জনের দু'জন, রিয়া আর ঋজু, আপন ভাইবোন। আর অর্ক, ইলেভেন সায়েন্স,পাঁচ ফুট দশ,নাকের তলায় সবে হালকাগোঁফের ছায়া, ওদের দু'জনের খুড়তুতো ভাই। এখন, বড় হওয়ার পর, আলাদা থাকলেও তিনজনের ছেলেবেলা কেটেছে একসঙ্গে। ওদের বোঝাপড়াটাও তাই বেশ ভাল। ছোটোবেলায়

যাও বা মাঝেমধ্যে ঝগড়া লেগে যেত তিন ভাইবোনে, এখন বড় হবার পর সেটাও বন্ধ।

আপাতত তিনজনের গন্তব্য উত্তরবঙ্গ। এখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। পুজোটা এবার একটু দেরিতেই হচ্ছে। আজই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি পড়ল। আর আজই বেরিয়ে পড়েছে ওরা। আসলে এই প্ল্যান ওদের একমাস আগে থেকেই করা। কলকাতা বা বর্ধমান কোথাও নয়, পুজোর হৈ-হট্টগোল থেকে এবার একটু দূরে থাকবে ঠিক করেছিল বলেই এই প্ল্যান। অর্কর ছোটো মেসো দময়ন্তীটি-এস্টেটের ডেপুটি ম্যানেজার হয়ে আসা ইস্তক ওদের জোর তাগাদা দিচ্ছিলেন একবার চা বাগানে ঘুরে আসার জন্য। যাওয়া আর হচ্ছিল না। এখন তো স্কুলে-টুলে ছুটিছাটা একেবারে ছেঁটে দিয়েছে। তার ওপর আবার সারা বছর জুড়ে শুরু হয়েছে পরীক্ষার হাঙ্গামা। এতে নাকি সবাই খুব চটপট পণ্ডিত হয়ে যাবে আর গণ্ডা গণ্ডা পরীক্ষা দিতে দিতে এমন ওস্তাদ হয়ে যাবে যে বড় হয়ে চাকরির পরীক্ষাগুলো তাদের কাছে একেবারে জলভাত হয়ে যাবে। তো শেষ পর্যন্ত যে কী হবে সেটা পরের কথা, এখন এসব ব্যাপারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। সেই মানাতে গিয়েই সময় আর বেরোচ্ছিল না। আর সেটা বেরোতেই এই প্ল্যানটাও মাথা থেকে বেরিয়ে গেল রিয়ার। দিদির পরিকল্পনায় দুই ভাইয়ের সোৎসাহ সমর্থন মিলতেও দেরি হয়নি।

ট্রেন এখন গুসকরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে লাইন ক্লিয়ার নেই। ঋজু ঘড়ি দেখল, সাড়ে ছ'টা। বেচারি হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত বেশ ম্রিয়মান ভাবেই কাটিয়েছে। ট্রেনে উঠেই রিয়া সেই যে বইয়ে মুখ গুঁজেছিল, একটা-দুটো ছাড়া কথাই হয়নি। ঋজুর আবার এসব ঠিক ভাল লাগে না। ও তখন

উত্তেজনায় ফুটছে। এই ওর প্রথম এইভাবে বাইরে যাওয়া। তার ওপর আবার রাতের ট্রেন। সরাইঘাট এক্সপ্রেস হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম ছাড়া মাত্রই ও বকবক শুরু করেছিল।

সেই উত্তেজনায় জল ঢেলে রিয়া বই নিয়ে বসা ইস্তক ওর মুড অফ হয়ে গিয়েছিল। সেটা কাটল বর্ধমানে অর্ক ওঠার পর। অর্ক ওঠার পর রিয়াও বই ব্যাগে পুরে দিয়েছিল।

তিন ভাইবোনে প্রাথমিক পরিকল্পনাটা করেছিল ফোনে ফোনে। কিন্তু পরিকল্পনা বানালেই তো আর হল না, সেটা অ্যাপ্রুভ করানোর একটা ব্যাপার থাকে। সে দায়িত্বটা অবশ্য নিয়েছিল রিয়া। দু'ভাই-ই ভাল করে জানে দিদি কিছু বললে বাবা-মা আপত্তি করে না। তবে ভাইয়েরা নিশ্চিন্ত হলেও রিয়া নিজেই একটু ভয় পেয়েছিল। খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো? বাবা-মা অবশ্য এক কথাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। আসলে মেয়ের ওপর ওদের অগাধ আস্থা। তাছাড়া এই মেয়েই তো একা একা গ্রিস থেকে ঘুরে এল। অবশ্য পুরো একটা দল গিয়েছিল, গিয়েছিল ভারতের প্রতিনিধি হয়ে।

আধ ঘণ্টা লেট করে ট্রেন যখন বোলপুর স্টেশনে ঢুকল ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা। তবে বোলপুরে আরদাঁড়াতেহল না। দু'ভাইয়ে উঁকি মেরে স্টেশনটা করে দেখার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। আর তার মিনিট পনেরো পর থেকেই আস্তে আস্তে একটা ব্যাগ থেকে বেরোতে শুরু করেছিল রাতের খাবার। এই ব্যাপারটা আগেও লক্ষ করেছে ঋজু, ট্রেনে আটটা-সাড়ে আটটা থেকে রাত্রি শুরু হয়ে যায়। অথচ এই কামরাতেই অর্ক ছাড়া বাকি একাত্তরটা সিটে লোক উঠেছে সেই হাওড়া থেকে। মানে সবাই প্রায় কলকাতার লোক। আর কলকাতার লোকের কাছে আটটা-সাড়ে আটটা মানে তো সবে সন্ধে। দিদিকে বলতে রিয়া